বাংলাদেশে মৌলবাদ

দেশের পত্রিকাগুলোতে প্রতিদিন মৌলবাদীদের নৃশংস কার্যক্রমের খবর আসছে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর নিয়মিত পাঠক হওয়ায় দেখতে পাচ্ছি মাদ্রাসায় জঙ্গিদের সশস্ত্র ট্রেনিংয়ের ছবি। তাই অজানা ভয় তাড়া করছে প্রতিনিয়ত। ইসলামী সশস্ত্র জঙ্গিরা কি ইসলামী বিপ্লবের ডাক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে! বাঙালি উদারমনা উন্নত সংস্কৃতির ধারক একটি জাতি। আমাদের লোকসংস্কৃতিতে ধর্মান্ধতা, উগ্রতার স্থান নেই। তাহলে মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীর উত্থান হলো কিভাবে! আসলে মৌলবাদীদের মূল ঘাঁটি হলো মাদ্রাসা। বিশেষ করে কওমি মাদ্রাসা। এসব মাদ্রাসায় তাদের জিহাদের পাঠ দেয়া হয়। ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করার ব্রত দেয়া হয়। এসব মাদ্রাসায় কি পড়ানো হচ্ছে তা দেখার দায়িত্ব অতীতে কোনো সরকার নেয়নি। বরং ভোটের রাজনীতির কারণে মাদ্রাসাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। যার পরিণতিতে আজ বাংলাভাই, অধ্যাপক গালিবের উত্থান হচ্ছে। এ দানবদের শুভবুদ্ধি কবে হবে সেটাই বিবেকমান মানুষের প্রশ্ন।

তুষার রহমান, আজিমপুর, ঢাকা

রাজনীতিতে তোরণ সংস্কৃতি

আমাদের দেশের রাজনীতিতে নেতা-নেত্রীদের স্বাগত জানানোর জন্য নির্মাণ করা হয় সুদৃশ্য তোরণ। আর এসব তোরণ নির্মাণে ব্যয় হয় লাখ লাখ টাকা। যেমন- শেখ হাসিনার পুত্র জয় ও তার স্ত্রীর টুঙ্গিপাড়া সফর ও ১২ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ জেলার ইউনিয়ন পরিষদ সম্মেলনের জন্য প্রধানমন্ত্রী পুত্র তারেক রহমানের চট্টগ্রাম সফর উপলক্ষে রাস্তার ওপর নির্মাণ করা হয় ১০০-২০০ তোরণ। আর এসব তোরণ নির্মাণে খরচ হয়েছে ১০-২০ লাখ টাকা। অথচ যাদের জন্য এই তোরণ নির্মাণ করা হয় তারা হয়তো বুলেট প্রুফ গাড়িতে বসে এসব তোরণগুলো দেখারই সুযোগ পায় না। তাই মঙ্গা, বন্যা ও শীতে কষ্ট পাওয়া লাখ লাখ গরিব মানুষের এই দেশে তোরণ নির্মাণ শুধু অর্থের অপচয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক সভায় এসব তোরণসহ বিভিন্ন ধরনের অপ্রয়োজনীয় খরচ সম্পর্কে রাজনীতিবিদগণের সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

শিল্পী, কৃষি ডিপ্লোমা কলেজ
শম্ভুগঞ্জ, ময়মনসিংহ

ডলস হাউস এবং আজকের নারীরা

বাড়ির মেয়েটি বাইরে বের হবার আগ মুহূর্তে শ্বশুরকে সালাম করার কথা বললে শ্বশুর সাহেব সালাম করার কারণ জানতে চাইলেন। মেয়েটি বললো যে, সে আজ চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছে। শ্বশুর জানতে চাইলেন এ চাকরি হলে বেতন কত হবে। মেয়েটি জানালো যে প্রারম্ভিক বেতন ছ'হাজার।
শ্বশুর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, এ চাকরির দরকার নেই। শ্বশুর আরো বললেন, তুমি মাসে মাসে যে বেতন পাবে তা আমিই তোমাকে দিয়ে দিবো। সংসারে তো কোনো অভাব-অনটন নেই, তবে আর কেন খামাখা সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকা। মেয়েটি কোনো কথা না বলে নিজের ঘরে ফিরে এলো।
মেয়েটি অর্থনীতিতে এম, এ করেছে। সে লেখা পড়া করেছে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য। বিয়ের আগে অভিভাবকগণ উচ্চশিক্ষিত মেয়ে খোঁজেন। বিয়ের পর বৌকে আর বাড়ির বাইরে বের হতে দেন না। অনেকে বাড়িতে যেমন দামি পশু-পাখি পোষেন এবং এর জন্য গর্ব করেন এটাও হচ্ছে তেমন একটি ব্যাপার। উচ্চশিক্ষিত বৌ এনে বাড়ির লোকেরা অন্যদের কাছে মান বৃদ্ধি করেন। বৌকে দিয়ে যদি ঘরের কাজই করাবে তবে উচ্চশিক্ষিত বৌ আনার প্রয়োজন কি? এ সমস্ত লোকদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষিত মেয়ে বৌ করার আগে তার মতামতের মূল্য দিতে হবে। মেয়েরা আর কতদিন সমাজ-সংসারের খেলার পুতুল হয়ে থাকবে?
হেনরিক ইবসেন মেয়েদের এই সামাজিক অবস্থানকে ডলস হাউসে তীর্যক মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। আজকের নারীরা কি তা থেকে মুক্ত হতে পেরেছে?

জাহাঙ্গীর চাকলাদার
লালবাগ, ঢাকা

ভাগ্যকে ধন্যবাদ

১৯ ফেব্রুয়ারি আরেকটি লঞ্চ দুর্ঘটনা ঘটল। এমভি মহারাজ লঞ্চটি ২৫০ জন যাত্রী নিয়ে বুড়িগঙ্গায় তলিয়ে গেলো। সেই সঙ্গে সলিল সমাধি হলো দেড় শতাধিক মানুষের।
এমভি মহারাজের মতো গত দুই বছরে অন্তত হাফডজন নৌডুবির ঘটনা ঘটল। এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে প্রায় ৮০০ অসহায় যাত্রী। গত বছর ২৩ মে ঝড়ের কবলে পড়ে মেঘনা নদীতে লঞ্চডুবির ফলে মারা গেছে শতাধিক যাত্রী। এর আগের বছর ২০০৩-এর জুলাই -এ চাঁদপুরগামী লঞ্চ ৭৫০ জন যাত্রীসহ ডুবে গেলে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু ঘটে ৫ শতাধিক যাত্রীর। ২০০৩-এর ৪ এপ্রিল অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাই একটি লঞ্চ অন্য একটি লঞ্চের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যে দুর্ঘটনা ঘটে তাতে ৮২ জন যাত্রী মারা যায়। এটা এখন একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে যে, যখন কোনো বড় নৌ-দুর্ঘটনা ঘটে, কর্তৃপক্ষ কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তদন্ত হয়, তদন্ত রিপোর্ট জমাও দেওয়া হয়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই হয় না। যার ফলে একের পর এক লঞ্চ দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। আমরা যারা সাধারণ যাত্রী হিসেবে চলাচল করি, তারা নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাই।

জেসমিন আরা খান
সেনপাড়া , ঢাকা

শিশুদের আর্তনাদ

বিশ্বের শিশুদের আর্তনাদ কারা শুনবে। মনে হচ্ছে যেন গোটা বিশ্বকে একটি কালো থাবা আঁকড়ে ধরেছে। আর এই কালো থাবায় চিৎকার করছে গোটা বিশ্বের শিশুরা। শুরু করা যাক নিজেদের দেশ ও মানুষকে নিয়ে। এখানে কি

প্রসঙ্গ: ম্যানহোল

ম্যানহোলের ঢাকনা চুরি করে ম্যানহোলটাকে উলঙ্গ করে তার মধ্যে পথিককে ফেলে তার দফারফা করার টেকনিক চোরদের অতি পুরনো নেশা এবং পেশা। এসব নিশি কুটুম্বদের তস্করবৃত্তির ধারায় ম্যানহোলের ঢাকনা থেকে শুরু করে পানির মিটার, মোটর ইত্যাদি আইটেম অন্তর্ভুক্ত করেছিল। ইদানীং এই তস্করদের পাল্লায় গ্যাস রাইজার পর্যন্ত স্থান নিয়েছে। গ্যাস রাইজার খুবই স্পর্শকাতর জিনিস। এই জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করা যে কত ভয়াবহ তা টেংরাটিলাবাসীর অভিজ্ঞতায় আছে। তারপরও চোরের দল কয়েক বাড়ি হতে এই আইটেম খুলে নিয়ে গেছে। কথা সেটা নয়, চোরেরা চুরি করবে এটাই নিয়ম এবং এইসব চোরদের দমন-প্রতিরোধের জন্য আছে আইন প্রয়োগকারী বাহিনী। কিন্তু সময়ের ধারাবাহিকতায় চোরেরা চুরিই করে কিন্তু ধরা পড়ে না। তাহলে আইন এবং তার শাসন কোথায়? একই জায়গায় পরপর চৌর্যবৃত্তির ঘটনা ঘটল অথচ তারা ধরাও পড়লো না। তাহলে কি এইসব তস্কর কোম্পানিদের ধরার জন্য আরেক ধরনের র‍্যাব বাহিনীর প্রয়োজন আছে?

মাহবুব হারুন বাবু
পূর্ব মণিপুর, মিরপুর
ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ

সেবা নয় ষড়যন্ত্র

আমাদের দেশে যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠছে ডায়াগনস্টিক সেন্টার। এর সঠিক পরিসংখ্যান কেউ জানে না, এমনকি বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও এর সঠিক সংখ্যা বলতে পারবেন না। বিধি নিষেধ থাকা সত্ত্বেও তারা তা যথাযথভাবে পালন করছে না। আর এই সুযোগে অবাধে অপরিকল্পিতভাবে ডায়াগনস্টিক সেন্টার গড়ে উঠছে।

মিরপুর দশ নম্বর থেকে এগার নম্বরের দূরত্ব আনুমানিক অর্ধ কিলোমিটার হবে, এর মধ্যে ১৪টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার আছে। তাদের প্রত্যেকের সরকারি অনুমোদন আছে কিনা তা দেখার বিষয়।

আমাদের চিকিৎসকগণও অর্থের প্রলোভনে পড়ে বেপরোয়াভাবে রোগীদের অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা লিখে শেয়ার নেয়। চিকিৎসক এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার মালিকদের এই অসাধু কর্মকান্ড যদি চলতে থাকে তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে। চিকিৎসা সেবা পাবে কোথায়?

আলাউদ্দিন আবু, মিরপুর-ঢাকা

সব শিশু শান্তি মতো ঘুমোতে পারছে? না পারছে না স্কুলে যেতে, পারছে না ঠিকমত খেতে,
অনেকের মুখে হাসি নেই।
ডাকলেই দেখা যায় চোখে পানি,
চিৎকার এবং আর্তনাদ।
আজ আমাদের দেশেই চলছে শিশুদের উপর অন্যায় ও অবিচার। হচ্ছে প্রতিনিয়ত খুন/ধর্ষণ, বিদেশে পাচার ইত্যাদি অন্যায় কাজ। এই সকল লোমহর্ষক পরিস্থিতিতে শিশুরা নিরুপায় হয়ে পড়েছে।
অন্যায়ের মাত্রা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এখন শিশুদের ওপর এসিড নিক্ষেপ করতেও দ্বিধাবোধ করছে না। শিশুদের জোরপূর্বক শিশু শ্রমের ওপর ঠেলে দিচ্ছে, ওদের দিয়ে করাচ্ছে অসামাজিক কাজ। এ তো কেবল আমাদের দেশের শিশুদের পরিস্থিতি। এছাড়া বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই শিশুরা অবহেলিত ও বঞ্চিত হচ্ছে।
১৯৮৯ সালের ২০ ডিসেম্বর বিশ্বের সকল শিশুরা অধিকার সংরক্ষণ লক্ষ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়। সনদে স্বাক্ষরকারী প্রথম ২২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ১৯৯০ সালের ৩ আগস্ট বাংলাদেশ শিশু অধিকার সনদে অনুস্বাক্ষর করে। শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এই সনদ এবং বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরটি অনুরূপ অন্যান্য ঘোষণা বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু কোথায় তাদের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন! শুধু বছর ঘুরলেই র‍্যালি ও কিছু সংখ্যক মানুষ নিয়ে পালন করে থাকে শিশু দিবস ও শিশু অধিকার। এর পরই তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় এবং এরই সঙ্গে সরকারও হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। কাজেই সরকার যেখানে ব্যর্থ সেখানে আমাদের নিজেদেরকেই এই দায়িত্ব নিতে হবে এবং প্রতিটি শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে যে সব শিশু খুবই দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, যারা ঠিকমত খেতে পরতে পারছে না, যারা ঝুঁকিমূলক কাজে নিয়োজিত রয়েছে তাদেরকে আমরা সাহায্য করতে পারি।
আমাদের দেশের যে সব শিল্প মালিক এবং ব্যবসায়ী রয়েছে এরা প্রতি বছরেই কোনো না কোনো দুর্যোগের সময় সাহায্য করে থাকেন। তাই ব্যবসায়ী ভাই ও শিল্প মালিক ভাইদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনারা যেভাবে পারেন এই সব শিশুদের পাশে এসে দাঁড়াবেন এবং আমরা যারা মধ্যবিত্ত পরিবারের তারাও চেষ্টা করবো যাতে করে একটি শিশুর অধিকার নিশ্চিত করতে পারি।

শামীম আহমেদ
মিরপুর-১৪
মুন্সীবাড়ি সড়ক, বাড়ি নং-১৯৯

চাই না হরতাল

আদিকালে ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য ব্যাপারে দূরদেশে যাত্রা করলে দোকানে বা প্রতিষ্ঠানে আলকাতরা দিয়ে লিখে যেতেন 'হরিতাল', অর্থাৎ দোকান কিছু দিন বন্ধ থাকবে। আর সমাজবিদরা বলেন, সেই হরিতাল থেকেই নাকি হরতাল শব্দটার উৎপত্তি। অথচ আজ হরতাল মানে গাড়ি ভাঙচুর, আগুন জ্বালিয়ে দেয়া, বোমাবাজি। হরতাল এখন রাজনৈতিক নেতাদের রাজনৈতিক কার্য সাধনের একমাত্র মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবে সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপদের দিকে ঠেলে দিয়ে, আমাদের রাজনৈতিক নেতারা কি হাসিল করতে চান কে জানে। দেশে এক এক করে বেশ কয়েক বার গ্রেনেড হামলা হয়েছে। সম্প্রতি গ্রেনেড হামলায় মৃত্যুবরণ করেন, এএমএস কিবরিয়া। তিনি কোন দলে ছিলেন সেটা বড় কথা নয় কিন্তু জাতি একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে হারিয়েছে সেটাই বড় কথা। বিরোধী দল এই ইস্যু নিয়ে হরতাল দিয়ে যাচ্ছে আর সরকারি দল হামলাকারীদের খুঁজে বের করবে বলে আশ্বাস দিচ্ছে। যদি কোনো তৃতীয় পক্ষ ঘটনাটি ঘটিয়ে যাচ্ছে সে থাকছে ধরাছোঁয়ার বাইরে, আর বিরোধী দল ও সরকারি দল একে অন্যকে দোষারোপ করে কাদা ছোড়াছুড়ি করছে আর সেই কাঁদায় লেপটে যাচ্ছে সাধারণ জনগণ। তারা ভুলে যান এই সাধারণ জনগণের ভোটে তারা নির্বাচিত হন দেশ পরিচালনার জন্য। অথচ এর খেসারত আবার আমাদেরই দিতে হয়। এভাবে আর কতদিন চলবে সাধারণ জনগণের সঙ্গে এই রসিকতা? এ থেকে আমরা মুক্তি চাই।

ডা. মোস্তফা আব্দুর রহিম
সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা

পানি ও জীবন

ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে অ্যাড আসছে 'পানি নিয়ে ভাবনা, আর না, আর না'- আমি বলবো, আসলেই ভাবনা রয়েছে, ভাবনা বাড়ছে দিনকে দিন। একদিকে পানিতে জীবাণুর ছড়াছড়ি, আর অন্যদিকে আর্সেনিকের দূষণ, বাংলাদেশের মানুষ আসলে ফ্যাসাদে আছে। ঢাকা শহরের অধিকাংশ এলাকায় এ ধরনের দুর্ভোগ পোহাতে হয় জনগণকে। আর যদিও কিছু পানি পাওয়া যায় তাতে হয়তো দেখা যায় ময়লা ভাসছে। তারপরও এক ফোঁটা পানির অনেক দাম বর্তমান বাংলায়। আসলে পানি হচ্ছে মানুষের জীবনের এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ, এক মুহূর্তও পানি ছাড়া বাঁচা সম্ভব নয়। এই জন্য বলা হয়, 'বিশুদ্ধ পানির অপর নাম জীবন'। দেশে যে পরিমাণ পানির প্রয়োজন তা তো পাওয়াই যাচ্ছে না- অপর দিকে প্রতিদিন গ্রামাঞ্চলে ও শহরে পানি দূষিত হচ্ছে বিভিন্নভাবে। শহরে প্রতিদিন পানি দূষণ ঘটছে কলকারখানার ক্ষতিকর রাসায়নিক বর্জ্য দ্বারা। অন্যদিকে গ্রামে ব্যাপক পানি দূষণ ঘটছে কৃষি জমিতে সার, কীটনাশক ব্যবহারের ফলে। পানির এ ধরনের দূষণের কারণে প্রতি মুহূর্তে মানুষের জীবন হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। ঢাকা শহরে প্রতি বছর ১০ হাজারেরও বেশি শিশু পানিবাহিত রোগে মারা যাচ্ছে। এ ছাড়াও রয়েছে আর্সেনিকের প্রভাব। ডা. অ্যালান স্মিথের মতে আগামী দশকে বাংলাদেশের প্রতি ৫টি ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর একটি হবে আর্সেনিক দূষণ থেকে সৃষ্ট ক্যান্সারের ফলে।

মোস্তফা
মিরপুর, ঢাকা

সেন্সরকৃত দৃশ্যাবলী

কয়েক দিন আগে চারটি ছবির সেন্সর সনদপত্র স্থায়ীভাবে বাতিল এবং তিনটির সনদপত্র স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। খালি চোখে উদ্যোগটি প্রশংসনীয়। কিন্তু কথা হলো এ ধরনের উদ্যোগ আগেও নেয়া হয়েছে। দেখা গেছে বাতিল হওয়া ছবিগুলোর কিছু কিছু অংশ বা দৃশ্য বাদ দিয়ে আবারও মুক্তির মিছিলে এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, যেসব ছবি সেন্সরে প্রাথমিকভাবে বাদ দেয়া হয় সেসব অংশ হল থেকে আবারও জুড়ে দেয়া হয়। ইদানীং চালু হয়েছে আরেকটি অশ্লীল ট্রেন্ড। সেন্সরকৃত বা বাদ দেয়া দৃশ্যাবলী সিডিতেও চোরাইভাবে বিক্রি হচ্ছে। অনেক সময় ছবিতে প্রয়োজনীয় দৃশ্যের নাম করেও অনেক আপত্তিকর দৃশ্য ক্যামেরার ধারণ করা নয়। সেখান থেকে সিডি হয়ে চলে যায় বাজারে। এ ধারা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে বিষয়টি কী যথেষ্ট উদ্বেগজনক নয়?

নাজমুল আহসান
মধুবাগ, মগবাজার